শেকডের সন্ধানে

++++++++

ধনকাজী ও মনকাজী নামে দুই ভাই ছিল । ধনকাজীর এক ছেলে আমার দাদা মরহুম মাওলানা আনোয়ার আহমদ । ছোটবেলায় একবার তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না । অনেক খোঁজা খুঁজির পর জানা গেল তিনি নাকি ভারত চলে গেছেন । সেখানে তিনি দেয়বন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কুরআন-হাদিসের উপর লেখাপড়ায় মশগুল হয়ে গেছেন।প্রায় ৭/৮ বছর পর তিনি ফিরে এলেন অনেকগুলো কেতাব নিয়ে । শুনেছি একদিন সকালে কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে চড়ে নামলেন ফাজিলপুর রেল স্টেশনে । সেখান থেকে গরুর গাড়িতে চড়ে মহদিয়া তার বাড়িতে পৌঁছালেন । “ধনকাজীর ছেলে ফিরেছে” বলে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল । আমাদের বাড়ির কাছারি ঘরটাকে তখন দাদা বানিয়ে ফেললেন মাদরাসা । সকালবেলা আশপাশের এবং অনেক দূরদুরান্ত থেকেও লোকজন কোরআন-হাদিসের বয়ান শুনতে আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করল। দাদা দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন-হাদিসের শিক্ষা চালিয়ে গেলেন।

আমাদের বাড়ির পার্শ্বেই বড় একটি ঈদ্গাহ ছিল ,এখনো আছে । সকালের বয়ান শেষে দাদা চলে যেতেন গরু নিয়ে মাঠে,বসতেন ঈদগাহের মাঝখানে অবস্থিত বৃহৎ তুলা গাছের নিচে । রাখালদের নিয়ে শুরু হত আবার হাদিসের বয়ান । এভাবেই চলছিল তার জীবন । অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং হয়ে গেলেন মাওলানা আনোয়ার আহমদ ।

তারপর বিয়ে-সাদি করে সংসারি হলেন এবং জন্ম হল বাবা মৌলবী ছিদ্দিক আহমদের । বাবাকেও পড়ালেন মাদরাসায় । বাবাও দাদার মত মাদরাসার পাঠ শেষ না করেই একদিন সকলের অজান্তে চলে গেলেন বার্মায় । সেখানে চাকুরি নিলেন মসজিদের ইমামতির । শুনেছি সেখানে তার গরুর খামারও ছিল। বাবার মুখে আরও শুনেছি, জাপান-বৃটিশের যুদ্ধের সময় তিনি বার্মায় বৃটিশের পক্ষে কাজ করেছিলেন । এ সম্পর্কিত লর্ড মাউণ্টবেটেনের স্বাক্ষর যুক্ত একটি সনদ এখনো আমার ব্যক্তিগত ফাইলে আছে । কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ মোটা অঙ্কের পুরস্কারও পেয়েছিলেন যা বার্মার দৈনিক পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় বার্মায় বাবার অনেক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি যা মনে করলে এখনো গা ছম ছম করে । যুদ্ধের অনেক পরেই বাবা দেশে ফিরিলেন এবং পরিনত বয়সেই বিয়ে করলেন এবং আমাদের তিন ভাই ও এক বোনের দুনিয়াতে আসার সুযোগ হল । বেশী বয়সের সন্তান বলে বাবা আমাদেরকে “বৈশাখ মাস্যা কাঁচা মরিছ” বলে আখ্যা দিতেন। বাবা দিবসে বাবাকে বড্ড মনে পড়ছে। সত্যিই বাবা হল বটবৃক্ষ।